Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজনীন আক্তার

রোলঃ 216021162227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজনীন আক্তার
রোলঃ 216021162227

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাজনীন আক্তার, আইডিঃ 216021162227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামি সভ্যতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

নাজনীন আক্তার

আইডিঃ 216021162227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সভ্যতা কী? 6

সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক নয় 7

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ 9

ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি 10

পশ্চিমা সভ্যতার সূচনাবিন্দু 15

মিশ্র সভ্যতা 17

নেতিবাচক ব্যবস্থা 18

উপমহাদেশে ইসলামি সভ্যতার বিপর্যয় 19

পাশ্চাত্য সভ্যতার আর্তনাদ 20

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা 27

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসলীলা 30

মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম শূন্যতা 33

শেষকথা 33

ভূমিকা

ইসলাম একটি আদর্শ জীবন ব্যবস্থা। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় ইসলামের ভূমিকা অত্যুজ্জ্বল। ইসলাম তার আবেদন নিয়ে পৃথিবীর সমগ্র মানচিত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে এক অনুপম প্রাণশক্তি। ইসলামের মহান আর্দশই ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রতিহিংসার কারণ। বিশ্বব্যাপী তাদের অনুদার ও সংকীর্ণ প্রচারণায় ইসলামকে প্রতিনিয়ত দানবীয় রূপে হাজির করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে আধুনিক বিশ্বের অনেকের কাছেই ইসলাম একটি ভীতিকর শব্দ, তাদের ইসলাম ধর্মের অনুসারী মানেই সন্ত্রাসী-উগ্রপন্থী।

ইসলামি মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যা নয়; বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে স্বয়ং ইসলামই তাদের মূল সমস্যা। কারণ এ ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদের জীবনাচার বা ইসলামের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। যদিও নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের দীনতা বর্তমানে তাদের মনকে দুর্বল করে রেখেছে। একইভাবে ইসলামের জন্যেও CIA (Central Intelligence Agency) কিংবা আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় সত্যিকার কোনো সমস্যা নয়; বরং পুরো পশ্চিমা সভ্যতাই তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা। কারণ তারাও বিশ্বাস করে যে, তাদের জীবনধারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশ্বজনীন। এমনকি তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, শক্তি প্রেয়াগ করে হলেও গোটা পৃথিবীর মানুষকে তা মেনে নিতে বাধ্য করা উচিত। ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্বের এই দ্বন্দ-সংঘাতের পেছনে এটাই হলো মূল কারণ।

বর্তমান সময়ে যদিও বা ব্যাপক মাত্রায় প্রচার করা হয়ে থাকে যে, "ইসলামি মৌলবাদই পশ্চিমাদের নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব ''নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' এর জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি"। পশ্চিমা মিডিয়াগুলো ইসলামি মৌলবাদকে বিশ্বের সকল সমস্যার মূল কারণ আখ্যা দিতে ব্যস্ত। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার একটি প্রবন্ধে এসেছে,

"বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা প্রধান হুমকি হিসেবে দৃশ্যপটে মুসলিম মৌলবাদ আবির্ভূত হচ্ছে বেপরোয়াভাবে। একইভাবে তা জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে নানাপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করছে। ১৯৩০ এর দশকে নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ, এবং পরবর্তীতে ৫০ দশকে সমাজতন্ত্র যে ভীতিকর অবস্থার জন্ম দিয়েছিলো, ইসলামি মৌলবাদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রয়েছে"।(১)

(১. নিউ ইয়র্ক টাইমস/ ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন, ৯/৯/৯৩)

মুসলিমরা নিজেদের সভ্যতাকে অন্য যে কোনো সভ্যতা থেকে শ্রেষ্ঠতর গণ্য করে। অধিকাংশ মুসলিম গর্বভরে দাবি করে যে, তাদের ধর্ম ইসলাম অন্য যে কোনো ধর্ম বা দর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ। "ইসলামি জীবন ব্যবস্থা বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ"– এই বিশ্বাসের স্বাভাবিক দাবি হিসেবে তাদের মধ্যে এ ধরনের আত্মবিশ্বাসী মনোভাব জন্ম নিয়েছে। আর এটা মনে করা তো সত্যিই যুক্তিসঙ্গত যে, আল্লাহর প্রেরিত ধর্মের অনুশীলন যে সভ্যতার জন্ম দেয় তা নিশ্চিতভাবে মানুষের গবেষণা, আন্দাজ-অনুমান থেকে উদ্ভূত সভ্যতা থেকে উৎকৃষ্ট হবে।

সভ্যতা কী?

ইংরেজি Civilization- এর বাংলা অর্থ হলো সভ্যতা। সমাজবিকাশের পদ্ধতি বা পর্যায় বিশেষ। Oxford English Dictionary অনুসারে ইংরেজি Civilize শব্দটির অর্থ হলো– আদিম বা অজ্ঞ অবস্থা থেকে উন্নতর অবস্থায় তুলে আনা, সভ্য করা, উন্নত ও শিক্ষিত করা।

বাংলা ভাষায় সভ্যতার আভিধানিক অর্থ হলো শিষ্ঠতা, সামাজিকতা, জীবনযাত্রা প্রণালীর উৎকর্ষতা। সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি সভা হতে এবং সভার অর্থ হলো যা সকলকে নিয়ে শোভা পায়। তাই এ অর্থে সভ্যতার অন্যতম অর্থ সামাজিক সুসংগত।

আবার সভ্যতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Civilization যা ল্যাটিন শব্দ Civilis থেকে এসেছে। Civilis এর অর্থ- নাগরিক। ইংরেজি প্রতিশব্দের বিবেচনায় আক্ষরিক অর্থে সভ্যতা বলতে সুসংহত নগর বা রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের অর্জিত গুণাবলিকে বুঝায়।

মূলত, সভ্যতা বলতে আমরা বুঝি মানুষ তার জীবনধারনের জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংগঠন সৃষ্টি করেছে তারই সামগ্রিক রূপ। কেবল যে আমাদের সামাজিক সংগঠনের নানারূপ রীতি এর অন্তর্গত হয়েছে তা নয়, নানাবিধ কারিগরি কলাকৌশল ও বাস্তব যন্ত্রপাতিও এর অন্তর্ভুক্ত। অথবা বিষয়টি এভাবেও বলা যায়– 'সভ্য জাতির জীবনযাত্রা নির্বাহের পদ্ধতি,

সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ও বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন করা মন-মগজের উৎকর্ষ সাধন'।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক নয়

ব্যক্তির সার্বিক সুস্থতা ও ক্রমপ্রবৃদ্ধির জন্য তার দেহ ও প্রাণ বা আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ উৎকর্ষতা একান্তই জরুরি। এটি যেমন সত্য তেমনি একটি জাতির উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুরোপুরি সংরক্ষিত হবে। কেননা সংস্কৃতি হলো প্রাণ আর সভ্যতা হলো দেহ।

অর্থাৎ মানবজীবন দুটি দিক সমন্বিত। একটি বস্তুনির্ভর, আর অপরটি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক। এ দুটিরই বিশেষ চাহিদা ও দাবি রয়েছে। সে চাহিদা পূরণে মানুষ প্রতিমুহূর্তে গভীরভাবে মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত থাকে। একদিকে যদি দৈহিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাকে টানে এবং জীবিকার সন্ধানে সে ব্যস্ত হয়, তাহলে তার আত্মার দাবি পূরণ করার জন্য তার মন ও মগজ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়। তাই মানুষের সূক্ষ্ম ও কোমল আবেগ অনুভূতি এবং আত্মার দাবি ও প্রবণতা যেসব উপায় উপকরণের মাধ্যমে পূর্ণ হয়, তা-ই হলো সংস্কৃতি। এসব মূল্যমান, মূল্যবোধ, হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকেই হয় সংস্কৃতির রূপায়ণ। কিন্তু সভ্যতার রূপ এর থেকে ভিন্নতর। নিচে সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটা তুলনামূলক পরিচয় উল্লেখ করা হলো–

- জীবন পরিচালনার জন্য এবং জীবনের গতিকে উৎকর্ষ ও সাবলীল করতে যা কিছু সাহায্যকারী তা সভ্যতা নামে অভিহিত। কিন্তু মন ও আত্মার কামনা-বাসনা ও সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের উপায় উপকরণকেই বলা হয় সংস্কৃতি।

- সভ্যতা ক্রম-বিকাশমান, প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল এবং নিত্য-নতুন দিগন্তের সন্ধানী। কিন্তু সংস্কৃতি প্রাচীনপন্থি।

- সভ্যতা দেশের সীমা বন্ধনমুক্ত বিশ্বজনীন ভাবধারা সম্পন্ন। সব ধরনের চিন্তাভাবনার লোকদের পক্ষেই তা গ্রহনযোগ্য। কিন্তু সংস্কৃতির উপর পরিবেশ ও ভৌগলিক

বিশেষত্বের ব্যাপক প্রভাব যুক্ত থাকে। যেমন: মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের সাংস্কৃতিক মেজাজ প্রকৃতির উপর তাদের বিশেষ ধর্মের সর্বাত্মক প্রভাব বিরাজমান।

- সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুগত প্রয়োজনাবলিই তার মূলক্ষেত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিভিন্ন শৈল্পিক দুর্লভ উপকরণ ও প্রতিষ্ঠানাদি এক দেশ ও জাতি থেকে ভিন্নদেশ ও জাতির মধ্যে চলে যায়। অনুন্নত জাতিগুলোও তা থেকে উপকৃত হয়। স্বভাব-প্রকৃতিগত পার্থক্য তার পথে বাধা হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করতে পারে।

এক সময় সভ্যতা ও সংস্কৃতি একই বলে গুছিয়ে ফেলা হয়েছিল, অজ্ঞতাবশত নয়। সেটা সচেতনভাবে করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকার স্বার্থে। ঐ প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল অসভ্য পার্থক্য দিয়ে ভিন্ন দেশের জনগণকে হেয় করা। অন্যদের প্রতি অসভ্য বর্বর বুনো– এসব শব্দ ব্যবহার করে পাশ্চাত্য শক্তি নিজেদের সভ্যতা ও উৎকর্ষ দাম্ভিকভাবে উপস্থাপন করে। সম্ভবত এই পর্যায়ে সংস্কৃতি শব্দটির ব্যবহার খুব একটা প্রচলিত ছিল না। সাধারণ জ্ঞানে যাকে আমরা ‘সংস্কৃতি’ বলে মেনে নিয়েছি সেটাকে পরিশীলিত মার্জিত কৃষ্টি জাতীয় একটা কিছুতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টার শুরু ১৯ শতকে, উপনিবেশ বিস্তার ও সুদৃঢ়করণের প্রক্রিয়াকালে।

পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতি একত্র করে ফেললে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। তবে এ কথা মনে রাখতেই হবে যে বাঙালির জন্য নয়, মানবতাকে রক্ষার জন্যই এ দুটিকে পৃথক রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আবুল ফজলের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—
‘সংস্কৃতি ও সভ্যতা কী জিনিস তা না জেনেই আমরা বিশেষ বিশেষ সভ্যতার প্রতি আগ্রহ ও পক্ষপাত দেখিয়ে থাকি। এই ভাবে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয় বলেই আমরা সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না’। *(আবুল ফজল, ১৯৬১:১২)*

সর্বোপরি কথা— সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ঢালাওভাবে এটা ঠিক নয়। বস্তুত সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটিই মানবজীবনের মৌল প্রয়োজন। যে জাতির জীবনে একসঙ্গে এ দুটির সমন্বয় ঘটেনি, তার উন্নতি অসম্ভব। সভ্যতা একটি জাতিকে বস্তুনিষ্ঠ শক্তিতে মহিমাময় করে আর সংস্কৃতি তাকে নির্ভুল পথে গতিবান করে। মানবসভ্যতার আধুনিক পর্যায়ে এ দুটির মাঝে গভীর একাত্মতা রয়েছে। তাই সভ্যতার অর্থে সংস্কৃতি বা

সংস্কৃতির অর্থে সভ্যতা গ্রহণ করা কিছুমাত্র অশোভন নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এভাবেই পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ

ইসলামি সভ্যতার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের ঘোষণা হলো, মানবজাতি ও ঘোটা বিশ্বজগৎ সুপরিকল্পিতভাবে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

ইসলাম শুধু কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম নয়। আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে জীবন-যাপনের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করেছেন। ঐসব জ্ঞানের সমষ্টিই হলো দ্বীন ইসলাম বা ইসলামি জীবনবিধান। মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি কীভাবে ব্যবহার করবে, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক জীবন কীভাবে পরিচালনা করলে দুনিয়ায় মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাবে, সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নবী রাসূলগণকে যে জ্ঞান দান করে পাঠিয়েছেন সেসবের সামষ্টিক নামই হলো দ্বীন ইসলাম।

পাশ্চাত্য সভ্যতা আল্লাহর হেদায়াতের কোনো প্রয়োজনবোধ করে না। ধর্মের নামে চার্চে বন্দি করে রেখেছে এবং চার্চের বাইরে আসার উপর ১৪৪ ধারার মতো নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তাই তারা গড থেকে কোন পথনির্দেশ নিতে রাজি নয়। তাদের কাছে গড-এর বাণী হিসেবে যে বাইবেল রয়েছে, তা তো মানব রচিত গ্রন্থ। ইঞ্জিল কিতাব যে ভাষায় নাজিল হয়েছিল বর্তমানে তার তো কোনো অস্তিত্ব নেই; তাহলে গড-এর পথনির্দেশ তারা কোথায় পাবে?

তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলেই বিশ্বস্রষ্টার কোনো অবস্থান নেই। তাদের জ্ঞানের উৎস সৃষ্টিকর্তা নয়, ইতিহাসলব্ধ মানবজাতির অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং মানুষের মেধা, প্রজ্ঞা ও সাধনালব্ধ জ্ঞানই তাদের একমাত্র সম্বল, তাই তারা সেক্যুলার হতে বাধ্য।

আজ পর্যন্ত কুরআনের কোনো জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। কারণ, বিজ্ঞান সৃষ্টিগতের যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তা যেমন আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, কুরআনও ঐ একই উৎস থেকে এসেছে। কুরআনের মতো কোনো বিশুদ্ধ জ্ঞান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে নেই। বিশ্বে মুসলিম শাসনামলে কুরআনই বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা জুগিয়েছে। বর্তমানে মুসলিম জাতি কুরআনের জ্ঞান চর্চা না করায় পাশ্চাত্যের দুয়ারে জ্ঞানের ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে।

ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি

ইসলামি সভ্যতার প্রধান ভিত্তিসমূহের একটি হলো, আখিরাতের জবাবদিহিতা। মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এর নৈতিক ফল মৃত্যু পরবর্তী জীবনে পাওয়া যাবে। এ বিশ্বাস ছাড়া কারও পক্ষেই নৈতিক মান রক্ষা করে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন সম্ভব নয়।

খ্রিষ্টধর্মে আখিরাতে বিশ্বাসের ধারণা থাকলেও গডকে ফাঁকি দিয়ে পাবার উপায় তারা আবিষ্কার করে নিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, যিশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিশুতে বিশ্বাসী সকল মানুষের যাবতীয় পাপের কাফফারা আদায় করে গেছেন। তাই তার প্রতি বিশ্বাস থাকলেই আখিরাতের জন্য যথেষ্ট। তাদের এ বিশ্বাস তাদের পাপ করার বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে। ক্ষমা যখন নিশ্চিত তখন পাপে দ্বিধা থাকবে কেন?

ইসলামে Honesty is a value আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় Honesty is a policy অর্থাৎ ইসলামের মতে সর্বাবস্থায় সততা অবলম্বন করতে হবে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় নীতি হিসেবে সততাকে লাভজনক বলে গ্রহণ করা হয়। ব্যবসায়ে উন্নতির স্বার্থে সততা প্রয়োজন; কিন্তু যদি ধরা পড়ার আশংকা থাকে তাহলে সততা জরুরি নয়।

অসৎ উপায়ে উন্নতি করতে বাধা নেই যদি আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। আইন, পুলিশ ও লোকলজ্জার ভয়ে সততা পালন করা হয়ে থাকে। মূলত ইসলাম অনুযায়ী আল্লাহর ভয়ে সৎ থাকতে হবে, যাতে আখিরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ, আইন ও পুলিশ

নাগাল না পেলেও এবং অন্য কোনো মানুষ না দেখলেও আল্লাহ সর্বাবস্থায় দেখছেন। তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার কারও কোনো সুযোগ নেই– এই বিশ্বাস নৈতিকতা মেনে চলতে বাধ্য করে।

কুরআনে বলা হয়েছে— আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনা ছাড়া কোনো মানুষ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। আর পাশ্চাত্য সভ্যতা এই চেতনার ধারই ধারে না।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, ইসলামি সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিগত দূরত্ব বিরাট। ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি হলো— "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ", যা থেকে তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, কিয়ামত ও বিচার দিবসের বিশ্বাসের কথা আসে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হলো, সেক্যুলারিজম, ডেমোক্রেসি, ডারউইনিজম, মেটেরিয়ালিজম ইত্যাদি। এসব মৌলিক ভিত্তির দিক দিয়ে ইসলামি সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা। এদের মধ্যে সমন্বয়ের বা সমঝোতার কোনো উপায় নেই।

সুতরাং উভয় সভ্যতার কৃষ্টি বা কালচারে বিরাট পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক কাঠামোতে, নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধ বিধান সম্পর্কে, আনন্দ-বিনোদন উপভোগের ধরনের ব্যাপারে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

ইসলাম তার অনুসারীদের ইসলামি সভ্যতার যে ভিত্তি প্রদান করেছে, যারা তা মেনে চলে তাদের চরিত্রে নিম্নরূপ গুণাবলি দেখা যায়–

১. তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করে, আখিরাতে আল্লাহর নিকট দুনিয়ার কৃত যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে বলে সর্বদা সতর্ক হয়ে জীবনযাপন করে।

২. তারা অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে সম্পদ হাসিলের চেষ্টা করে না। কারও সাথে প্রতারণা করে না। তবে এক-দুজন পাপাচারী থাকবে, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না। তদ্রুপ এটিকে মৌলিক বিষয় হিসেবে গণ্যও করা যাবে না।

৩. কারও উপর তারা সামান্য অন্যায় করে না।

৪. নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য নারীদের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে না। এমনকি পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টিও দেয় না।

৫. ইসলাম দুনিয়াকে ভোগ করার যতটুকু অধিকার দিয়েছে এবং যে নিয়মে ভোগ করার অনুমতি দিয়েছে, একমাত্র ততটুকুই তারা নির্ধারিত নিয়মে ভোগ করে। তারা বৈরাগ্য অবলম্বন করে না। এমনকি ভোগবাদীদের মতো লাগামহীনও হয় না ইত্যাদি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি দেশে ইসলামি জীবনবিধান জনগণের নিকট পেশ করেন, যে দেশে সেকালের সভ্য দুনিয়ার (রোম ও পারস্য সভ্যতা) কোনো আলো পৌঁছেনি। সভ্য দুনিয়া তাদের বর্বর জাতিব বলেই মনে করত। তারা বংশানুক্রমিকভাবে গোত্রে গোত্রে মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানিতে লিপ্ত ছিল। লেখাপড়ার চর্চা ছিল না বললেই চলে। জনগণের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কারণ, দেশে কোনো একক সরকারের অস্তিত্বই ছিল না।

এমন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহবান জানালে মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে গোটা আরবে এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, যা মানবজাতির ইতিহাসে সেরা কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা যারা গ্রহণ করেছেন তাদের চরিত্রে উল্লিখিত গুণাবলি সৃষ্টি হওয়ার ফলেই আরবের বর্বর জাতি উন্নত সভ্য জাতিতে পরিণত হয়। ইসলামি সভ্যতায় সমৃদ্ধ এ জাতি কিছুদিনের মধ্যেই রোম ও পারস্য সভ্যতার উপর বিজয় লাভ করে। এ কারণে মাইকেল হার্ট তার লেখা 'দি হানড্রেড' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মানবজাতির ইতিহাস থেকে বাছাই করা ১০০ জন মনীষীর মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিসমূহকে যারা সঠিক বলে মনে করে তাদের চরিত্র নিম্নরূপ হওয়া স্বাভাবিক—

আল্লাহর নিকট থেকে কোনো জ্ঞান নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করে না বলে তারা নফসের গোলাম হতে বাধ্য। নফস মানে দেহের দাবির সমষ্টি। দেহের যাবতীয় দাবি পূরণ করতে

বিনা বাধায় তারা তৎপর। দেহের কোনো নৈতিক চেতনা না থাকায় তারা নৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত অবস্থায় বস্তজগৎকে ভোগ করতে থাকে।

সকল মানুষের মধ্যেই নৈতিক চেতনা রয়েছে। এ চেতনাধারীরাই আসল মানুষ। তাই দেহের দাবি পূরণের পথে নৈতিক চেতনা অবশ্যই আপত্তি করে। কিন্তু তারা আল্লাহকে ভয় করে না এবং আখিরাতকে পরওয়া করে না বলে ঐ চেতনা সর্বাবস্থায় সক্রিয় থাকে না। আইন ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আশংকা না থাকলে এবং লোকলজ্জার ভয় না থাকলে বিবেকের বিরুদ্ধে দেহের দাবি পূরণ করতে তারা দ্বিধা করে না।

তারা স্বাভাবিক কারণেই গ্রিক দার্শনিক Epicurus- এর ভোগবাদী দর্শনের অনুসারী হয়ে যায়। ভোগবাদী দর্শনের কথা হলো, মানব জীবনের লক্ষ্যই উপভোগ করা। এই এপিকিউইয়ান ফিলসফির স্লোগানই হলো, Eat, drink and be merry অর্থাৎ খাও-দাও, ফুর্তি করো। এটাই তাদের জীবনের নেশা হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের জীবনে এরচেয়ে বড় কিছু জীবনের লক্ষ্য বলে গণ্য হয় না। অবশ্য যারা চিন্তাশীল, গবেষক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, লেখক, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবি, তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকলেও অবসর সময়ে তাদের ভেতর ঐ ভোগবাদী মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করে।

তাদের মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যৌনসম্পর্ক আইনসিদ্ধ বলে স্বীকৃত। তাই তাদের পারিবারিক জীবন সুখময় হতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই মনে করে তাদের জীবনসঙ্গী অন্যের শয্যাসঙ্গী হতে পারে। এটাকে তারা দূষণীয় মনে করে না। তাদের সন্তানের পিতা কে, তা নিশ্চিত নয় বলে তাদের পাসপোর্টে শুধু মায়ের নাম লেখা হয়ে থাকে, পিতার নাম থাকে না। কারণ, মা-ই শুধু নিশ্চিত জানা। সিঙ্গেল মায়ের সংখ্যাও প্রচুর। তাদের দাম্পত্যজীবন স্থায়ী নয়, ব্যাপক হারে তালাক হয়।

নৈতিক উন্নয়নের চর্চা না থাকায়, আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনার অভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের মতো যোগ্য ও জাঁদরেল প্রেসিডেন্ট, হিলারির মতো সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী হওয়া স্বত্তেও হোয়াইট হাউজে কর্মরত মনিকা লিউন্সকিকে তার শয্যাসঙ্গী হতে বাধ্য করেন। মনিকা যখন তা প্রকাশ করে দেন তখন প্রসিডেন্ট তখন অস্বীকার করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন। প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের আশঙ্কা

দেখা দিলে জাতির নিকট ক্ষমা চেয়ে তিনি রেহাই পান। তার যোগ্যতার খাতিরে তাকে ক্ষমা করা হয়।

পাশ্চাত্য দেশগুলোতে তাদের পারিবারিক জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা নেই বলে তাদের জীবনে বৃদ্ধ বয়সটা রীতিমতো অভিশাপ ও দুর্বিষহ। মুসলিম সমাজে বৃদ্ধ পিতা-মাতা যে সম্মান, যত্ন, মহব্বত লাভ করে তা পাশ্চাত্যে কল্পনাও করা যায় না। সেখানে বৃদ্ধরা পরিবারে সবচেয়ে অবহেলিত।

এখন চিন্তা করুন, যে সমাজে পিতা-মাতার মর্যাদার এই অবস্থা, আপনি নিজের সন্তানকে ওই সমাজের পোশাক পরাতে, তাদের ভাষা আর চালচলন শিখাতে ব্যস্ত। এজন্য আমাদের উচিত, আমরা নিজেদের ছেলেমেয়েকে ইসলামি তাহজিব ও তামাদ্দুন শিখিয়ে বড় করা। সাথে পাশ্চাত্যের এই অভিশপ্ত সভ্যতা পরিহার করা।

পশ্চিমা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দেশে জনপ্রিয়তা ধরে রাখার স্বার্থে তারা যতই জনকল্যাণ মূলক কাজ করুক, নিজ দেশের স্বার্থে অন্য দেশের উপর চরম জুলুম করাকে কৃতিত্ব মনে করে। তাদের দেশের স্বার্থে অন্য দেশে গণহত্যা চালাতে সামান্য দ্বিধাও তারা করে না। নীতির দিক দিয়ে তারা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে। ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে তাদের মাপকাঠি নিজেদের দেশের জন্য এক রকম, অন্য দেশের জন্য ভিন্ন রকম। তারা নিজেদের খ্রিস্টান মনে করে বলে বিশ্বের সকল খ্রিস্টানদের জন্য তাদের পলিসি এক রকম আর সকল মুসলিমদের জন্য অন্য রকম।

যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলামি সভ্যতার ধারকরা সতর্কতার যে বিধান মেনে চলে, পাশ্চাত্য এর কোনো ধারই ধারে না। ইসলাম সাধারণ মানুষ হত্যা করা, বিশেষ করে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকরা যেখানেই যুদ্ধ করে সেখানে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়, জনবসতি ধ্বংস করে এবং নির্দ্বিধায় চরম হিংস্র আচরণ করে। যুদ্ধবন্দীদের সাথে পশুসুলভ জঘন্য নির্যাতন করে।

পশ্চিমা সভ্যতার সূচনাবিন্দু

আজকের পশ্চিমা সভ্যতার মূল কেন্দ্র হলো ইউরোপ। পশ্চিমা সভ্যতাকে প্রায়ই গ্রিক-রোমান সভ্যতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ এর সূচনা হয়েছিল মূলত গ্রিস এবং রোমে। ইউরোপের অন্যান্য অংশ ছিল তখনো বর্বরতা আর অন্ধকারে নিমজ্জিত। তবে অন্য সবখানের মতো গ্রিস এবং রোমেও মূর্তিপূজাই ছিল তাদের আনুষ্ঠানিক ধর্ম। তারা নানা রকম দেবতার উপাসনা করত। তারা মনে করত মানুষ এবং সেই দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য হলো কেবল এই যে, দেবতারা অমর আর মানুষ মরণশীল; এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ঘটনার সবকিছু এই দেবতারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। যেমন, দেবতা জিউস (Zeus) আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে, পসেইডন (Poseidon) এর হাতে আছে সমুদ্রের কর্তৃত্ব, ফল-ফসলের মালিক দেবতা ডেমেটার (Demetar)। আরও আছে, হেরা (Hera), যে হচ্ছে বিয়ের দেবী, আছে ফরচুনা (Fortuna), যার হাতে আছে ভালো-মন্দ অর্থাৎ ভাগ্যের চাবিকাঠি, ডায়না (Diana) হচ্ছে প্রেমের দেবী, এরকম আরও অনেক। গ্রিক পুরাণ মতে, প্রধান দেবতা জিউস (Zeus রোমে যাকে জুপিটার হিসেবে অভিহিত করা হয়)। এর নেতৃত্বে অলিম্পাস পাহাড়ে এই দেবতাদের বসবাস। মানুষের অবয়বে মূর্তি বানিয়ে এই দেবতাদের পূজা করা হতো। আর তাদের উপাসনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, এসব দেবতার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু বলি দেওয়া। দেবতাদের বলির পশুও ভিন্ন ভিন্ন হতো। যেমন, হেরা দেবীর জন্য উৎসর্গ করা হয় গরু, জিউস এর জন্য ষাঁড়, আর দেবতা ডেমেটার'র জন্য বলি হতো শূকর। (২)

(২. দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৫, পৃ: ৪৬২)

প্রাচীন গ্রিক, রোমান এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতিগুলোর মাঝে পৌত্তলিক চেতনা বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ এখনো পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় ; যদিও বা তাদের জীবন থেকে ধর্মীয় অনুশাসন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন, প্রতিটি দিনের নামের কথাই ধরুন। সব দেশেরই নিজ ভাষায় সপ্তাহের প্রতিটি দিনের নাম আছে, তবে ইংরেজি নামগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এগুলোর সাথে পৌত্তলিকতার ওতপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান। রোমানরা যে দিন যে গ্রহের উপাসনা করত, সে দিনের নাম রাখা হয়েছে সেই দেবতার নামের সাথে মিল রেখে। শনিবার বা Saturday শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Saeterndaeg থেকে, যার মনে হচ্ছে 'শনি বা Saturen এর দিবস' (Saturn-স্যাটার্ন হলো রোমানদের কৃষিদেবতা)। রবিবার বা Sunday এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ Sunnandaeg থেকে, যার অর্থ হলো 'সূর্যদিবস', আর সোমবার বা Monday এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ

Monandaeg থেকে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোর নামের উৎপত্তি জার্মান পুরাণে দেবতাদেরকে যে নামে অভিহিত করা হতো সেগুলোর ব্রিটিশ-ফরাসি প্রতিশব্দ থেকে। যেমন, মঙ্গলবার, ইংরেজিতে বলা হয় Tuesday, এটি এসেছে Tiwesdaeg থেকে, এর মানে হলো Tiw (Tiw মানে Tyr নামক নরওয়েজিয়ান যুদ্ধদেবতার নামের ইংরেজি-ফরাসি প্রতিশব্দ) এর দিবস। বুধবার বা Wednesday এসেছে Wodnesdaeg থেকে, এর মানে Woden এর দিবস, সে জার্মানদের প্রধান দেবতা। বৃহস্পতিবার বা Thursday এসেছে Thunor (Thor) থেকে, বজ্রদেবতার ইংরেজি-ফরাসি প্রতিশব্দ অনুসারে। আর সর্বশেষ শুক্রবার এসেছে Frigedaeg থেকে, যার অর্থ দেবী ফ্রিগ (Frig) এর জন্য নির্ধারিত দিবস। সৌন্দর্য আর ভালোবাসার দেবী ফ্রিগ (Frig) হচ্ছে দেবতা Woden এর স্ত্রী।(৩)

(৩. চেম্বার্স পকেট ডিকশনারী, ডব্লিউ এন্ড আর চেম্বার্স লিমিটেড, নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ১২, পৃ:৫৫৫)

পশ্চিমা সভ্যতার শিকড় সন্ধানে বের হলে তার আরেকটি পরিচয় আমাদের সামনে দৃশ্যমান হবে। আর তা হলো এটি ইহুদি-খ্রিষ্টান সংস্কৃতি ভিত্তিক একটি সভ্যতা। ঈসা (আঃ) ছিলেন ইহুদি জাতির মধ্যে প্রেরিত একজন নবী। তিনি মূলত 'তাওরাত' এর অনুসরণ করতেন। খ্রিষ্টানরা বাংলায় যাকে যিধু খ্রিষ্ট বলে থাকে আর ইংরেজিতে Jesus। কিন্তু ঈসা (আঃ) যে শিক্ষা দিয়েছিলেন কালক্রমে তার সাথে গ্রিক ও রোমানদের পৌত্তলিকতা মিশে গিয়ে তার প্রকৃত শিক্ষার বিশুদ্ধতা নষ্ট করে ফেলে। তৎকালীন রোমান এবং গ্রিকদের দেবতাদের আকৃতি ছিলো মানুষের মতো। তাদের ব্যাপারে এই ধারণা প্রচলিত ছিলো যে, তারা মানুষের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং সে সম্পর্ক থেকে জন্ম নেয় অর্ধদেবতা বা হাফ-গড। অনুরূপভাবে তাদের গড়া নতুন ধর্মে যিশু খ্রিষ্টকে বানানো হলো 'রক্তমাংসের ঈশ্বর' বা 'মানবদেবতা'। তিনি এই পৃথিবীতে মানবরূপে মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন এমন এক নারীর গর্ভে, যিনি সাধারণ মানুষের মতো চলতেন ফিরতেন। ঈসা (আঃ) তার মা মারইয়াম এবং খ্রিষ্টধর্মের কিছু সাধু-সন্ত ব্যক্তির মূর্তি পরবর্তীকালে খ্রিষ্টানদের উপাসনার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। সমবেত উপাসনার দিন সাবাত বা শনিবারের পরিবর্তে রবিবার নির্ধারণ করা হয়। রোমে রবিবার ছিলো সূর্য দেবতা 'অ্যাপোলো' কে উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। 'অ্যাপোলো' হলো রোমানদের শীর্ষ দেবতা জুপিটারের পুত্র। এভাবে তাদের উপাসনার নির্ধারিত দিনকে সরিয়ে আনার পেছনে অভিসন্ধি ছিলো রোমানদেরকে তাদের ঈশ্বরের পুত্র অ্যাপোলোর সাথে Jesus এর সাদৃশ্য দেখিয়ে তাদেরকে খ্রিষ্টান ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করা।

খ্রিষ্টবাদের সাথে পৌত্তলিকতার সংমিশ্রণের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ক্রিসমাস ডে, যাকে প্রাচীন ইংরেজিতে বলা হয় Cristes maesse, অর্থাৎ খ্রিষ্টের আগমন। কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই রোমান ক্যাথলিক চার্চ ২৫ ডিসেম্বরকে যিশু খ্রিষ্টের জন্ম তারিখ হিসেবে গ্রহণ করে। এর আগে সর্বশেষ তার জন্মদিন উদযাপনের রেকর্ড পাওয়া যায় ৩৩৬ সালে রোমে। এই ২৫ ডিসেম্বরের সাথে মিলে যায় রোমানদের অজয় সূর্যের জন্মদিন (natalis solis invicti) এর উৎসব। এই উৎসব উদযাপিত হতো সূর্যের দক্ষিণায়নের দিনে, যেদিন থেকে দিনের দৈর্ঘ্য বাড়তে শুরু করে। এই তারিখটি আরও মিলে যায় স্যাটার্নালিয়া উদযাপন দিনের সাথে (১৭ ডিসেম্বর), যে দিন উপহার বিনিময় করা হয়।(৪)

(৪. দ্য নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ভলিউম ৩, পৃ: ২৮৩)

গাছপালার উপাসনা করা ছিলো পৌত্তলিক ইউরোপিয়ানদের খুব সাধারণ রীতির একটি। পরবর্তীকালে তারা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও চিরসবুজ গাছ বা ক্রিসমাস ট্রি দিয়ে ঘরবাড়ি সাজানোর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান প্রথার মধ্য দিয়ে তাদের এই পৌত্তলিকসুলভ অভ্যাসটি টিকে থাকে।

মিশ্র সভ্যতা

এই সভ্যতা নিজ প্রশস্ত গণ্ডিতে শামিল করেছিল অনেক কিছু: আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, তত্ত্বীয় বিধি-বিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও নির্মাণশিল্প সংক্রান্ত আশ্চর্যজনক ও অভিনব জ্ঞান-বিজ্ঞান যা পাশ্চাত্য জাতির উন্নতির দীর্ঘ ভ্রমণের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল। এই সভ্যতা সাধারণ মানবিক জ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞান, কারিগরি ও গণিতশাস্ত্রের উন্নতির অবশ্যম্ভাবী সফলতা অর্জন করেছিল। এটি বিজ্ঞ ও দক্ষ পদার্থবিদদের ধারাবাহিক চেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষারও নির্যাস ছিল। এ হিসেবে ওটা বিভিন্ন অংশ ও উপাদানের এমন একটি মিশ্রণ ছিলো যার সম্পর্কে একই ধরনের কোনো মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই মিশ্র সভ্যতা এক পর্যায়ে অসম্পূর্ণ ও আরেক পর্যায়ে সম্পূর্ণ ছিলো। অপকারীও ছিলো, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারী ও যথার্থও ছিলো। কোন ক্ষেত্রে সঠিক ছিলো, আবার

কোন ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত ছিলো। তার মধ্যে ঐ সমস্ত প্রকাশ্য ও সন্দেহাতীত জ্ঞানের সঙ্গে এমন ত্রুটিপূর্ণ অনুমান, কল্পনা ও চিন্তা এবং তাদের ধারণা মতে এমন সিদ্ধান্তও অন্তর্ভুক্ত ছিলো যার মধ্যে বাদানুবাদ, গভীর চিন্তা ও বিবেচনার স্থান রয়েছে। তার মধ্যে এমন জ্ঞানের ফলাফলও ছিলো যা গভীর চিন্তা ও বিবেচনা এবং ধ্যান ও অভিজ্ঞতার সারভাগ ছিলো। আর এমন কিছু ছিলো যার সম্পর্কে কিছু বলা সময়ের পূর্বে কথা বলা হতো। আর এমন অংশ ও উপাদানও ছিলো যা কোন বিশেষ দেশ ও জাতির জন্যে নির্দিষ্ট নয়। যেমন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। আর এমন জিনিসও ছিলো যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থানীয় প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিলো এবং পাশ্চাত্য পরিবেশ ও সামাজিকতার গভীর ছাপও তাদের ওপর পড়েছিলো। ওটা সেই ঐতিহাসিক বিপ্লব ও ঘটনাসমূহের ফল ছিলো যা পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে নিজ কাজের সীমা ও কেন্দ্রের মধ্যে অতিক্রম করতে হয়েছিলো। আবার এমন জিনিসও ছিলো যার দীন ও আকীদার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিলো। আর এমন অংশ ছিলো যার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্কই ছিলো না।

সভ্যতার এই মিশ্রণ এই বিষয়টিকে অধিক কঠিন করে দিয়েছে এবং এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে। মুসলিম বিশ্বকে এক সংকটপূর্ণ ও কঠিন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে এবং মুসলিম বিশ্বের নেতা ও চিন্তাবিদদের বুদ্ধিমত্তার জন্যে এটি একটি পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে দাড়িয়েছে।

নেতিবাচক ব্যবস্থা

এই নতুন ও কঠিন অবস্থা হতে বাঁচার জন্য তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথম ব্যবস্থা হলো বিরুদ্ধাচারণ করা অর্থাৎ মুসলিম বিশ্ব এই সভ্যতার সমস্ত ফলাফল ও উপকারিতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করবে। তার কোনো ভালো বা মন্দ কথা শুনতে ইচ্ছুক হবে না। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে ঐ সভ্যতা হতে একদিকে সরে পড়া এবং তা হতে কোনো ফল ভোগ না করা, এমন কি ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক না রাখা, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা পাশ্চাত্য জাতি শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি পাশ্চাত্য জাতি হতে অর্জন করা নিষিদ্ধ মনে করা এবং নতুন যন্ত্রপাতি, মেশিন, আসবাবপত্র ও জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসকে গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা।

উপমহাদেশে ইসলামি সভ্যতার বিপর্যয়

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্তমান মুসলিম জাহানের অধিকাংশ দেশই সোনালী যুগের মুজাহিদদের প্রচেষ্টায় বিজিত হয়েছে। যারা এই দেশগুলো জয় করেছেন, তারা রাজ্য বিস্তার কিংবা ধনার্জনের নেশায় নয়, বরং দুনিয়ার বুকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যেই জীবন পণ করে নিজেদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছিলেন। তারা দুনিয়াবী ভোগসক্তির বদলে পরকালীন সুখাভিলাষের নেশায় বিভোর ছিলেন। এ জন্যই তারা বিজিতদের শুধু নিজেদের অনুগত ও করদাতা বানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাদেরকে ইসলামি রঙে রাঙিয়ে তুলবারও ব্যবস্থা করেন। তাদের গোটা জনসংখ্যা কিংবা তার অধিকাংশকেই তারা মিল্লাতে ইসলামিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেন। পরন্তু জ্ঞানচর্চা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের ভেতর ইসলামী চিন্তাধারা ও সভ্যতাকে এমনিভাবে দৃঢ়মূল করে দেন যে, পরবর্তীকালে তারা নিজেরাই ইসলামি কৃষ্টি -সভ্যতার নিশানবরদার এবং ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষকে পরিণত হন। এগুলো ছাড়া বাকি দেশগুলো বিজিত হয় সোনালী যুগের বহু পরে। তখন ইসলামি প্রাণ-চেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলো এবং বিজেতাদের হৃদয়ে খালেস আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্খাই অধিক প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐসব দেশে ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজ বহুলাংশে সফল হয়। এমনকি ঐ দেশগুলোতে ইসলাম নিরঙ্কুশ জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির মর্যাদা লাভ করে।

মুসলিম ভারতের ইতিহাস এবং তার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এদেশে যখন মুসলমানদের রাষ্ট্রশক্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিলো তখনও ইসলামের প্রভাব ছিলো অত্যন্ত দূর্বল। এখানকার পরিবেশ যথার্থ ইসলামি পরিবেশ ছিলো না। অবশ্য হিন্দুদের ধর্ম ও তমদ্দুন হিসেবে তা হয়ে পড়েছিলো আরও নিষ্প্রভ। কিন্তু তবু মুসলিম শাসকদের উদারতা ও গাফেলতির পরিবেশে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকায় এবং মুসলমানরা পুরোপুরি ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ না করায় এখানকার মুসলমানদেরও একটি বিরাট অংশ নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস ও কৃষ্টি সভ্যতার দিক দিয়ে ততোটা পরিপক্ক ও পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারেনি, যতোটা হতে পারতো খালেস ইসলামি পরিবেশে।

ইসলামে ধর্মের ধারণা হলো, তা হচ্ছে মানুষের জীবন বিধান। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যে ধর্মের ধারণা হচ্ছে তা একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস মাত্র, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। ইসলামে প্রথম জিনিস হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, আর পাশ্চাত্যে আদপেই আল্লাহর

অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। ইসলামের গোটা কৃষ্টি ও সভ্যতাই ওহী ও রিসালাত সংক্রান্ত প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর পাশ্চাত্যে ওহীর সভ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ এবং রিসালাতের যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় রয়েছে। ইসলামে আখিরাত বিশ্বাস হচ্ছে গোটা জীবন পদ্ধতি ও আচরণবিধির ভিত্তি, আর পাশ্চাত্যে এই ভিত্তিটাই ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত। ইসলামে যেসব ইবাদত বন্দেগী ও ক্রিয়াকান্ড ফরজ বলে গণ্য, পাশ্চাত্যে তা শুধু জাহিলী যুগের অর্থহীন প্রথা মাত্র। এইভাবে ইসলামের গোটা তাহযীব ও তমদ্দুন পাশ্চাত্যের কৃষ্টি সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আইনের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, আল্লাহই হচ্ছেন আইন প্রণেতা; রাসূল আইনের ব্যাখ্যাতা, আর মানুষ শুধু আইনের অনুগত মাত্র। কিন্তু পাশ্চাত্যে আইন প্রণয়নে খোদার কোনো অধিকারই স্বীকৃত নয়। সেখানে আইন পরিষদ হচ্ছে আইন প্রণেতা আর জনগণ পরিষদের নির্বাচক। রাষ্ট্রনীতিতে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে খোদায়ী হুকুম কায়েম করা, আর পাশ্চাত্যের লক্ষ্য জাতীয় রাষ্ট্র। ইসলামের লক্ষ্য বস্তু হিচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদ আর পাশ্চাত্যের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। অর্থনীতিতে ইসলাম হালাল উপার্জন এবং যাকাত ও সদকা প্রদান ও সুদ বর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, আর পাশ্চাত্যের গোটা অর্থ ব্যবস্থাই সুদ ও মুনাফার ভিত্তিতে চালিত। নীতিশাস্ত্রে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে আখিরাতের সাফল্য আর পাশ্চাত্যের লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়ার মঙ্গল।

মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে আধুনিক শিক্ষা হিমালিয়ান উপমহাদেশের মুসলমানদের যতোই কল্যাণ সাধন করুক না কেনো, তাদের ধর্ম ও সভ্যতার যে বিরাট ক্ষতিসাধন করেছে, কোনো কল্যাণের দ্বারাই তা পূর্ণ হতে পারেনা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আর্তনাদ

১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে আলীগড় ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন উপলক্ষে লর্ড লোথিয়ান একটি ভাষণ দেন। তার এই ভাষণটি ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আধুনিক ও প্রাচীন পন্থীদের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এতে তাদের জন্য প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এই ভাষণে এমন এক ব্যক্তি আমাদের সামনে তার দিল দিমাগের পর্দা উন্মোচন

করেছেন, যিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার সৃষ্ট সভ্যতাকে দূর থেকে দেখেননি; বরং নিজে সেই সভ্যতার কোলে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন এবং জীবনের সুদীর্ঘ ৫৬টি বছর সেই সমুদ্র মন্থনে অতিবাহিত করেছেন। তিনি পয়দায়েশী ও খান্দানী সূত্রে ইউরোপিয়ান এবং অক্সফোর্ডে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি কোনো বৈদেশিক পর্যবেক্ষক নন, তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতারই স্বগৃহের লোক। এ হিসেবেই তিনি আমাদেরকে সেই ঘরের আসল বিকৃতি, তার কার্যকারণ এবং ঘরের লোকেরা বর্তমানে কিসের জন্যে পিপাসার্ত, তা বিবৃত করেছেন।

লর্ড লোথিয়ান তার ভাষণের শুরুতেই বলেনঃ
"আর একটি বিচার্য বিষয়ের প্রতি আমি আজ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার যে মারাত্মক কুফল আজ ইউরোপ ও আমেরিকা ভোগ করছে, ভারতবর্ষ কী তা থেকে বেঁচে থাকতে পারে? আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে পাশ্চাত্যে দু'টি বিরাট পরিণাম ফল উদ্ভূত হয়েছে। একদিকে সে প্রকৃতি এবং তার শক্তিগুলোর ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে অনেক প্রশস্ত করে দিয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ সমাজে এবং সাধারণভাবে গোটা দুনিয়ায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় অনুশাসনকে দুর্বল করে দিয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর অন্তত অর্ধেক বিকৃতি এই দু'টি কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আজকের সুসভ্য মানুষ বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত শক্তির নেশায় আত্মহারা বটে, কিন্তু সে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমাজ তমুদ্দনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ক্ষেত্রে সুষম উন্নতি সাধন করতে পারেনি। অথচ এ জিনিসটি বৈজ্ঞানিক শক্তিকগুলোকে মানুষের ধ্বংসের পরিবর্তে তার কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারতো।

সায়েন্টিফিক স্পিরিট ক্রমশ লোকদের ভেতর থেকে পুরনো কুসংস্কারগুলো দূর করে দিয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে এবং এভাবে প্রাচীনকালের বহু বন্ধন থেকে নর-নারীকে মুক্তিদান করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে সে মানুষকে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সত্যেরও প্রচন্ড মুখাপেক্ষী করে তুলেছে। অথচ সত্য অবধি পৌঁছাবার কোনো পথের সন্ধান সে দিতে পারেনি। আজকের অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসী শিশুসুলভ ক্ষিপ্রতা, বৈচিত্র বিলাস ও ইন্দ্রিয় সুখের নেশায় বিভোর। অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের সামর্থ তাদের থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের পেশকৃত আদিম, অসীম ও অনন্ত সত্যের সঙ্গে তাদের কোনোই সংযোগ নেই।

ধর্ম মানুষের জন্য অপরিহার্য পথিকৃত। মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক লক্ষ্য, মর্যাদা ও তাৎপর্য লাভ করার এটিই একমাত্র মাধ্যম। এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংকুচিত হবার ফলে

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বংশগত ও শ্রেনীগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক অপকৌশলের প্রতি পাশ্চাত্য দুনিয়া আসক্ত হয়ে পড়েছে এবং যে বিজ্ঞান বস্তুগত উন্নতিকেই চরম লক্ষ্য বলে আখ্যা দেয় এবং জীবনকে দিন দিন জটিল ও দুর্বিষহ করে তোলে তার প্রতি ঈমান এনে বসেছে। পরন্তু বর্তমান যুগের সবচাইতে বড় আপদ জাতীয়তাবাদের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য আত্মা ও জীবনের মধ্যে যে ঐক্যের প্রয়োজন, সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাও আজকের ইউরোপের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-ও হচ্ছে ধর্মীয় কর্তৃত্ব হ্রাস পাবার একটি উল্লেখযোগ্য ফল।

ভারতের দু'টি বৃহৎ ধর্ম হিন্দুমত ও ইসলাম কি পাশ্চাত্যের ধর্মীয় বিদ্বেষের চাইতে বেশি সাফল্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের সমালোচনা ও সন্ধানী ভাবধারার মোকাবিলা করতে পারবে? এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যদি ভারতকে পাশ্চাত্যের ওপর আপতিত বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে হয়, তবে এই প্রশ্নটির প্রতি এদেশের চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় নেতৃত্ববৃন্দের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এটা নিসন্দেহ যে, সন্ধানী ভাবধারা ক্রমে ক্রমে ভারতের জনগণের মধ্য থেকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার উৎপাদন গুলোকে বিলীন করে দিবে এবং এটা খুবই ভালো কাজ হবে। কিন্তু এই জিনিসটি কী ভারতের রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও শৈল্পিক জীবনের ভাবী নেতৃবৃন্দের মন মগজ থেকে উভয় ধর্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূলনীতিকেও বের করে দেবে? আমি হিন্দুমত ও ইসলামের অভ্যন্তরীণ জীবন সম্পর্কে বেশি পরিচিতির দাবিদার নই। তবু আমি মনে করি, এই দু'টি ধর্মের মধ্যে এমন সব উপাদান রয়েছে, যা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষ ও মেয়েদেরকে আয়ত্তাধীন রাখার ব্যাপারে এর যেকোনো একটিতে যোগ্য করে তুলতে পারবে। খ্রীষ্টধর্ম তো এ ব্যাপারে এমন কতকগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাসজাত বন্ধনের ফলে ব্যর্থকাম হয়েছে, যা এই ধর্মের মহান প্রবর্তকের পেশকৃত সত্যতাকেই গোপন করে ফেলেছে"।

এখানে লর্ড লোথিয়ান নিজেই স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্ববাদ ও ইসলাম সম্পর্কে তার বেশি কিছু জানাশোনা নেই। তিনি শুধু দূর থেকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য জিনিস দেখতে পেয়েছেন। তার মতে এই জিনিসগুলো আধুনিক সমালোচনা ও সন্ধানী ভাবধারার মুকাবিলায় শিক্ষিত লোকদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চতর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সফলকাম হতে পারে। কিন্তু যারা এই উভয় ধর্ম তথা ভারতের সমস্ত ধর্মের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত তাদের কাছে এটা মোটেই গোপন নয় যে, সমালোচনা ও সন্ধানী ভাবধারার মুকাবিলায় টিকে থাকতে চাইলে একমাত্র ইসলামই টিকে থাকতে পারে; বরং স্পষ্টতম ভাষায় বলতে গেলে, এমনি ভাবধারাসহ কোনো ধর্মের পক্ষে তার অনুবর্তীদের

নিয়ে সামনে এগোবার এবং প্রগতি ও আলোকের যুগে গোটা মানবজাতির ধর্মরূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর কারো নেই। খ্রীষ্টধর্ম কেন ব্যর্থকাম হয়েছে? কেবল এই জন্যই যে, তা কোনো সামাজিক মতাদর্শ নয় বরং তা সমাজবদ্ধতারই ঘোর বিরোধী। এ কারণেই ইউরোপের জাতিগুলো উন্নতি ও তরক্কির পথে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম তাদের সহায়ক হবার পরিবর্তে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তার বন্ধনকে ছিন্ন করেই তাদের এগিয়ে চলতে হয়। হিন্দুধর্মের অবস্থাটাও এরই সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তার কাছেও কোন প্রগতিশীল জীবন দর্শন, কোন যুক্তিসম্মত নৈতিক বিধান ও কোন প্রসারমান সমাজ পদ্ধতি বর্তমানে নেই। আজ পর্যন্ত হিন্দুদেরকে একটি সমাজ পদ্ধতিতে বেঁধে রাখার এবং অন্যান্য সভ্যতার প্রভাব গ্রহণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার ব্যাপারে সবচাইতে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে তাদের বর্ণাশ্রম প্রথা। কিন্তু বর্তমান যুগের সমালোচনা ও সন্ধানী ভাবধারার সামনে এই বন্ধনটি ছিন্ন হতে বাধ্য এবং এটি ছিন্ন হবেই। এরপর আর কোন জিনিস হিন্দু সমাজকে ভাঙ্গনের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেনা। ফলে তার রুদ্ধ দরজা বহিঃপ্রভাবের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। পরন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজবিধান, পুরনো মূর্তিপূজা মূলক কুসংস্কার এবং তাদের অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক দার্শনিক মতগুলো আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও সমাজ সচেতনতার সামনে টিকে থাকতে পারেনা। তাই এখন হিন্দুরা দিন দিন এমন কে এক চরম সন্ধিক্ষণের নিকটবর্তী হচ্ছে যেখানে তাদের এবং বহুল অংশে ভারতের ভাগ্য নির্ণীত হবে। হয়তো তারা ইউরোপের রেনেসাঁ আমলের খ্রীষ্টানদের নেয় ইসলামের প্রতি বিমুখ ও বিদ্বেষান্ধ হয়ে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার পথ অবলম্বন করবে, নতুবা দলে দলে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকবে।

এই ফয়সালা বহুলাংশে মুসলমানদের, বিশেষত প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষিত লোকদের কর্মধারার উপর নির্ভর করছে। কারণ ইসলাম শুধু তার নামের জোরেই কোন মু’জিযা দেখাতে পারেনা। তার নীতি ও আদর্শ শুধু কিতাবের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ থাকলে তার পক্ষেও কোন মু'জিযা দেখানো সম্ভবপর নয়। যে অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে বর্তমানে মুসলমানরা লিপ্ত রয়েছে, যে জড়তা ও স্থবিরতা তাদের আলিম সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং যেরূপ নারীরসুলভ ভীরুতা ও লাজুকতা তাদের নব্যশিক্ষিত বংশধরদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে ভারতের আত্মাকে জয় করা তো দূরের কথা, ইসলামের দাবিদারগণ নিজেদের জায়গায়ই টিকে থাকতে পারবে বলে আশা করা যায়না।

বিপ্লবের খরস্রোতের মুখে কোন জাতির স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। হয় তাকে স্রোতের মুখে ভেসে যেতে হবে, নতুবা পূর্ণ বিক্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে স্রোতের গতিমুখ ঘুরিয়ে দিতে হবে। এই দ্বিতীয় অবস্থানটি কেবল এভাবেই সৃষ্টি হতে পারে যে, প্রথমত,

সাধারণ মুসলমানদের নৈতিক অবস্থার সংশোধন করতে হবে এবং তাদের মধ্যে ইসলামী জিন্দেগীর মূল ভাবধারা উজ্জীবিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আলিম সমাজ ও নব্য শিক্ষিত মুসলমানদের মিলিতভাবে ইসলামী নীতির আলোকে জীবনের আধুনিক সমস্যাবলী অনুধাবন করতে হবে এবং আদর্শ ও বাস্তব উভয় দিক থেকেই সেগুলো সুষ্ঠু সমাধান পেশ করতে হবে। যাতে করে অন্ধ বিদ্বেষী ছাড়া প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষই স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, একটি প্রগতিশীল সমাজের পক্ষে ইসলামিক কৃষ্টি ও সভ্যতা ছাড়া আর কোন ভিত্তিই নির্ভুল ও নির্দোষ হতে পারেনা।

বর্তমান যুগের যুক্তিবাদী মানুষ খ্রীষ্টধর্মকে খুব ভালোমতো যাচাই পরখ করে দেখেছে। এ ধর্মটি যে তার ব্যাধির কোন প্রতিকার নয়, একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের দেয়ালের দর্শন এবং তাদের ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখে কখনো কখনো সে মুগ্ধ হয় বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রথম আঘাতেই তাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্ম তো অনেকটা খ্রীষ্টধর্মেরই ভারতীয় সংস্করণ। আর হিন্দুধর্ম নিজেই এমন সব সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করে চলেছে, যেগুলো থেকে নিস্তার লাভের আশায়ই বর্তমান যুগের যুক্তিবাদী মানুষ ধর্মের প্রয়োজন অনুভব করছে। এর চৌহদ্দির ভেতরেই মানুষে মানুষে অযৌক্তিক বৈষম্য সবচাইতে বেশি লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক শোষণের সবচাইতে নিকৃষ্ট রূপ, অর্থাৎ মহাজনী ও সুদখোরী এর বিধি ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণ অর্থাৎ মানুষের গোত্রীয় বিভাগ ও বিদ্বেষ, তার ভিত্তিমূলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। তার প্রতিষ্ঠিত সমাজ পদ্ধতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেনা; বরং তাকে বেশুমার শ্রেণী ও গোত্রে বিভক্ত করে দেয়। তার সমাজবিধান এতই প্রাচীন ও জরাজীর্ণ যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবধর্মী চেতনার যুগে হাজার হাজার বছরের খানদানি হিন্দুরা পর্যন্ত সেগুলাকে লঙ্গন করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এগুলোর ভিত্তি জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের ওপর নয়; বরং বিদ্বেষ ও কুসংস্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল পার্থিব বিষয় ছাড়াও ন্যায় শাস্ত্র ও আধ্যাত্মবাদের ক্ষেত্রে আরো বেশি অকেজ বলে মনে হয়। বিশ্ব প্রকৃতির গোপন রহস্যাবলীর সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা করার মতো কোনো চাবিকাঠি তার কাছে নেই। তার প্রত্যয়গুলো নিছক কাল্পনিক বিষয়ে মাত্র, তার কোন একটি বিষয়ের পক্ষেও কোন বৈজ্ঞানিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ পেশ করা যেতে পারেনা। নীতিশাস্ত্রের ব্যাপারে চিত্রহারী কল্পনার একটি ইন্দ্রজাল সে অবশ্যই সৃষ্টি করে। যেমন একটি ইন্দ্রজাল মহাত্মা গান্ধী ও সৃষ্টি করেছেন কিন্তু যুক্তি প্রমাণ ও বাস্তব বিচার বুদ্ধি থেকে তা একেবারেই শূন্য। কাজেই বর্তমান বৈজ্ঞানিক চেতনার যুগে তার ব্যর্থতা যে খুব শীঘ্রই প্রকটিত হয়ে উঠবে এটা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়। এরপর বাকি

থাকে শুধু ইসলাম। বস্তুত আজকের যুক্তিবাদী মানুষ তার ঈস্পিত ধর্মের জন্য যেসব মাপকাঠি পেশ করেছে বা করতে পারে তার প্রতিটি মাপকাঠিতে ইসলাম পুরোপুরি উত্তীর্ণ।

ধর্ম নিছক একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং শুধু ব্যক্তিগত নীতিবোধের সঙ্গেই এর সম্পর্ক রয়েছে, এ কথা আজকে বাসি হয়ে গেছে। আসলে এ হচ্ছে ঊনিশ শতকেরই এক বিশেষ খামখেয়ালি মাত্র। অথচ বিশ শতকের এই চতুর্থ দশকে বসেও আমাদের দেশের এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল লোক এই মতবাদটি প্রচার করে চলছে। এই শ্রেণীর লোকেরা 'প্রগতি' 'প্রগতি' বলে চিৎকার করা সত্ত্বেও হামেশা চলমান বিশ্বের চাইতে পঞ্চাশ বছর পেছনে চলতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আজকে এ কথা প্রায়ই সর্বজন স্বীকৃত বলা চলে যে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির কোন চিন্তাই করা যেতে পারেনা। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই অপারেটর ব্যক্তির সঙ্গে বেশুমার ছোট বড় সম্পর্ক জড়িত। ধর্মের প্রয়োজন যদি থেকে থাকে তবে তা শুধু ব্যক্তির নিজস্ব মনোতুষ্টি বা পরকালের মুক্তির জন্য নয়; বরং গোটা সমাজের সংগঠন এবং পার্থিব জীবনের তাবৎ কাজ কারবার পরিচালনার জন্যই প্রয়োজন। আর তার প্রয়োজন না থাকলে ব্যক্তি বা সমাজ কারোর জন্যই নেই। সমাজের বিধি ব্যবস্থা হবে এই একরূপ আর ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচারণ হবে তার থেকে ভিন্নরূপ, এটা নিছক বালকসুলভ বক্তব্য বৈ কিছুই নয়। সমাজ জীবনের সাথে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচারণের যদি কোন সম্পর্ক না থাকে, তবে তো তেমন বিশ্বাস ও আচরণ একেবারেই নিরর্থক। শুধু নিরর্থক নয়; বরং যে সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য অংশের সাথে তা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়, সেখানে তার বিলুপ্তি অনিবার্য। কাজেই দু'টি পন্থার মধ্যে কেবল একটি পন্থাই গৃহীত হতে পারে। হয় গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে একেবারে ধর্মহীন করতে হবে এবং কমিউনিস্ট মতবাদ অনুসারে মানব জীবন থেকে ধর্মকে চূড়ান্তরূপে নির্বাসিত করতে হবে; নতুবা সমাজ জীবনকে পুরোপুরি ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে এবং ইসলামের দাবি অনুসারে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি তমুদ্দুন উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মকে একমাত্র দিশারী বলে মানতে হবে। প্রথম পন্থাটি মানুষ বহুকাল ধরে পরীক্ষা করে দেখছে। তার যে বিষতিক্ত ফলের কথা লর্ড লোথিয়ান উল্লেখ করেছেন, তা-ই তা থেকে উৎপন্ন হতে পারে এবং তা-ই উৎপন্ন হয়েছে। আর ভবিষ্যতেও এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটবেনা। এমতাবস্থায় দুনিয়ার মুক্তি কেবল দ্বিতীয় পন্থাটির মধ্যে নিহিত এবং এই পন্থাটি বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু পূর্বে যেমন বলেছি, এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা কিংবা একে চিরতরে হারিয়ে ফেলার সম্পূর্ণত মুসলমানদের ইচ্ছাধীন। বাস্তব ঘটনা দুনিয়া এবং দুনিয়ার একটি অংশ হিসেবে আমাদের এই দেশকে এমন এক স্থানে নিয়ে এসেছে, যেখান থেকে চলার গতি

ইসলামের দিকেও ঘুরে যেতে পারে আবার বস্তু তন্ত্র ও নৈতিক অরাজকতার অতল গহ্বরে গিয়েও পৌঁছা সম্ভব। সম্ভবতই তার গতি আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় পথের দিকেই রয়েছে; কারণ এক সুদীর্ঘকাল থেকে দুনিয়া এ পথেই এগিয়ে চলছে। অবশ্য এই পথের নানা বিপদাপদ ও বিভীষিকা দেখে সে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছে এবং এছাড়া কোন বাঁচার পথ আছে কিনা, চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে তাও নিরীক্ষণ করছে। কিন্তু বাঁচার কোন পথই তার দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছেনা। প্রকৃতপক্ষে তাদের দৃষ্টিশক্তিকে আবরণমুক্ত করা এবং ইসলামের সহজ সরল পথকে একমাত্র মুক্তির পথ বলে প্রমাণ করার মতো শক্তিশালী নেতৃবৃন্দের জন্য তারা প্রতীক্ষমান। এমন মুজাহিদ ও মুজতাহিদদের কোন দল যদি মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তো তারাই গোটা পৃথিবীর দিশারী হতে সক্ষম। এমতাবস্থায় পূর্বে যে মর্যাদার আসনে তারা অভিষিক্ত ছিল এবং সেখানে পাশ্চাত্য জাতিগুলোকে অধিষ্ঠিত দেখে আজকে তারা লালায়িত হচ্ছে, সে আসন আবার তারা লাভ করতে পারে। কিন্তু এ জাতির সংখ্যাগুরু অংশ যদি আজকের মতোই হতাশা ও নিরুৎসাহের সঙ্গে বসে থাকে, তার যুব সম্প্রদায় যদি পরের উচ্ছিষ্ট ভোজনকেই চরম স্বার্থকতা মনে করে, তার আলিম সমাজ যদি প্রাচীন ফিকাহ ও কালামের অন্তঃসারশূন্য বিতর্কে লিপ্ত থাকে, তার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকৃষ্ট মানসিকতা যদি ভিন জাতির পদাঙ্ক অনুসরণকেই 'জিহাদী মনোবৃত্তির' উচ্চতম আদর্শ বলে গণ্য করেন এবং আপন জাতিকে বিশ শতকের সবচাইতে বড় প্রতারণার ফাঁদে নিক্ষেপ করাকেই বিরাট কৃতিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা বলে ভাবেন— ফলকথা এই বিশাল জাতির আপাদমস্তক সবটাই যদি নিষ্ক্রিয়তা ও অকর্মন্যতায়ই লিপ্ত থাকে এবং এই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে থেকে কয়েকজন মর্দে মু'মিনও আল্লাহর পথে জিহাদ ইজতিহাদ ও সংগ্রাম সাধনার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে আসতে না পারেন, তাহলে দুনিয়া যে অতল গহ্বরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সে গহ্বরে এ জাতিও একদিন নিক্ষিপ্ত হবে। তারপর আল্লাহর গজব আরেকবার গর্জন করে উঠবেঃ

"ধ্বংস হোক জালিম সম্প্রদায়"

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা

যেদিন থেকে মুসলিমরা নিজেদের স্থবির সমাজব্যবস্থার পুনর্জাগরণের জন্য পশ্চিমাদের অনুকরণকে একমাত্র উপায় হিসেবে ভেবে নিয়েছে, সেদিন থেকেই তারা আত্মমর্যাদা খুইয়ে ফেলেছে। আর 'ইসলাম একটি মৃতপ্রায় শক্তি'– পাশ্চাত্যের এই দাবিকেও পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়েছে।

ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা পুরোপুরি ভিন্ন দুটি জীবনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলনীতির দিক থেকেও একটি অপরটির জন্য মানানসই নয়। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ওদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক দর্শন ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখন আমরা কি করে এটা আশা করতে পারি যে, পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম যুবকরা ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব থেকে বেঁচে থাকতে পারবে?

এর পক্ষে কোন যুক্তি দেখানোর সুযোগ নেই। হয়তো তুখোড় মেধাবী কিছু যুবক ওদের সাথে টেক্কা দিয়ে চলতে পারবে। তবে এটা খুবই বিরল ঘটনা। পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা নবীজির বার্তার প্রতি মুসলিম যুবকদের আস্থাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ধর্মীয় চেতনায় বলিয়ান ইসলামী সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে তৈরি হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করে ফেলছে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা পশ্চিমা মূল্যবোধকে আপন করে নিয়েছেন, ইসলামী বিশ্বাস থেকে তারা অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্য আমরা এটা বুঝাচ্ছি না যে, ইসলাম স্রেফ অশিক্ষিত লোকদের বাস্তব জীবনেই নির্ভেজাল অবস্থায় টিকে আছে। কিন্তু একটা কথা মানতেই হয়— ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-ঘেঁষা বুদ্ধিজীবীদের চাইতে এদেরকেই আমরা বেশি তৎপর দেখি। হতে পারে তাদের বুঝ কিছুটা ভাসা ভাসা। শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বীন-বিমুখ হওয়ার কারণ এটা নয় যে, পশ্চিমাদের বিজ্ঞান চর্চা করতে করতে তারা বেড়ে উঠেছেন, সেটা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন যৌক্তিক প্রমাণ হাজির করতে পেরেছে। আসলে পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎটাই ধর্মবিদ্বেষী। এটা মুসলিম প্রজন্মের ধর্মীয় প্রতিভার উপর ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে একে পিষ্ট করে ফেলেছে।

স্রেফ যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করে ধর্মকে বিশ্বাস-অবিশ্বাস করাটা খুবই বিরল ঘটনা। আমরা বলতে পারি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ তার অর্জিত জ্ঞান অথবা ধীশক্তির কারণে কোন একদিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ তার সাংস্কৃতিক বলয়ের মাধ্যমে এই বুঝ অর্জন করে। একটি বাচ্চার কথা চিন্তা করুন। বাল্যকাল থেকেই তাকে বাদ্যযন্ত্র জমকালো

সুরের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ‘সুর-তাল-লয়’ শুনে ওর কান অভ্যস্ত। পরবর্তী সব সময় যদি সে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে কিংবা গান গাইতে নাও পারে, অন্তত কঠিন গানগুলো সহজেই বুঝতে পারবে। কিন্তু যে বাচ্চাটি ছোটকাল থেকেই গান বলতে কিছু শোনেনি, তার জন্য গানের মর্ম উপলব্ধি করা তো দূরের কথা, সুর বোঝাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তেমন। তবে এমনও কিছু মানুষ আছে, জন্ম থেকে যাদের কান নেই। ফলে তারা গান শুনতে পায় না। তাই এমনটা হতে পারে যে, ধর্মের বাণী শোনার ক্ষেত্রেও কিছু লোক নিজেকে পুরোপুরি বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু বেশিরভাগ জনতার ধর্মের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস করার বিষয়টি নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর। যেমনটা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

“প্রতিটি নবজাতকই ইসলামি ফিতরাতের ওপর জন্মলাভ করে। এরপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী হিসেবে গড়ে তোলে”। *[সহীহ বুখারী, ১/১২৭৫]*

বক্তব্যের সারকথা অনুযায়ী, হাদিসে বর্ণিত ‘মা-বাবা’ শব্দ দুটোকে একটু বিস্তর পরিসরে ব্যবহার করা যায়। যেমনঃ পারিবারিক জীবন, স্কুল, সমাজ ইত্যাদি– যেসব মাধ্যম দিয়ে শিশুর প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। এটা অস্বীকার করার জো নেই, নৈতিক অবক্ষয়ের এই যুগে অনেক মুসলিম পরিবারেই দ্বীনচর্চার অবস্থা খুব বেগতিক। আর বুদ্ধিভিত্তিকভাবেও তাদের অধঃপতন ঘটছে। তাই উঠতি বয়সীদের দিন-বিমুখতার প্রথম উদ্দীপক হিসেবে কাজ করছে তার পরিবার। সর্বদা এটা নাও হতে পারে। কিন্তু মুসলিম সন্তানদের পশ্চিমা ভাবধারায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তার মধ্যে অবশ্যই ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ পাবে।

এখন আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে দাঁড়ায়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলিমদের আপত্তি জানানোর দ্বারা আদৌ এটা বুঝায় না, ইসলাম এই ধরনের জাগতিক শিক্ষার বিরোধী। এর পক্ষে ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ নেই। পুরো কুরআন জুড়ে আছে জ্ঞানার্জনের উপদেশ। কুরআনের নানা জায়গায় বলা হয়েছে– “যাতে করে তোমরা জ্ঞানবান হতে পারো”, “যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করো”, “যাতে করে তোমরা জানতে পারো” ইত্যাদি। এই মহিমান্বিত কিতাবের শুরুর দিকে বলা হয়েছেঃ

وَعلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন"। *[সূরা বাকারাহ, ২:৩১]*

জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, তার জন্য কুরআনের আয়াত এবং নবীজির হাদীস টেনে আনার দরকার নেই। কোন প্রকার সংকোচ ছাড়াই ইতিহাস এটা সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলামের মতো অন্য কোন ধর্মই বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ব্যাপারে এতটা উৎসাহ দেয় নি। জ্ঞানার্জন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলাম যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তার গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন আমরা দেখতে পাই উমাইয়্যা ও আব্বাসী খিলাফতের আমলে এবং স্পেন ও সিসিলিতে আরবদের শাসন চলাকালে। আমি এগুলা বড়াই করার জন্য বলছি না। ইসলামী বিশ্ব আজ তার ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছে। রুহানি দিক থেকে হারিয়ে গিয়েছে অন্ধকারে, ডুবে আছে বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতায়। অধঃপতনের এই যুগে গৌরবময় অতীত নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলা আমাদের সাজে না। তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ইসলাম অনুশাসনের জন্য এক চুলও দায়ী নয়। এটা মুসলিমদের গাফিলতির ফসল।

জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং উন্নয়নের পথে ইসলাম কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে এতটাই মর্যাদা দিয়েছে যে, এই জ্ঞানের কারণে মানুষ ফেরেস্তাদের চাইতেও উঁচু মাকাম পেয়েছে। আজ পর্যন্ত কোন ধর্মই জ্ঞান চর্চার প্রতি এতটা গুরুত্ব দেয়নি। আমরা যদি এই দ্বীনের মূলনীতি মেনে চলি, তবে কখনোই আধুনিক শিক্ষাকে আমাদের জীবন থেকে বাদ দেওয়ার কথা কল্পনা করতে পারব না। পশ্চিমা দেশগুলোর মতো বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জন করতে চাইলে আমাদের মধ্যে অবশ্যই জ্ঞান চর্চা এবং উন্নতির ইচ্ছা থাকতে হবে। তবে পশ্চিমাদের চশমা দিয়ে দেখা ও পশ্চিমা ভাবধারার আলোকে চিন্তা করার আগ্রহ মুসলমানদের মধ্যে বিলকুল থাকা যাবে না। ঈমান টিকিয়ে রাখতে চাইলে, ইসলামের আখিরাতমুখী সভ্যতাকে বস্তুবাদী, পুঁজিবাদী কিংবা মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা দিয়ে বদলানো যাবে না।

সংক্ষেপে বলা যায়, এসব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিই হলো মুখ্য বিষয়। বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে এটাই আমাদের চিন্তা শক্তিকে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞান আমাদেরকে মহাবিশ্বের ভুলভাল ব্যাখ্যা দিতে প্ররোচিত করতে পারে না। বিজ্ঞান আসলে বস্তুবাদী কিংবা পরকালমুখী কোন বিষয় নয়। মহাবিশ্বের ব্যাখ্যা আখিরাতমুখী হবে নাকি দুনিয়ামুখী, সেটা নির্ভর করে আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। পাশ্চাত্যের উঁচু তাবকার পরিশীলিত বুদ্ধিবৃত্তি অনেক আগ থেকেই বস্তুবাদ দ্বারা প্রভাবিত। তাই এর মৌলিক

চিন্তাধারা ষোল আনাই ধর্মবিদ্বেষী। ওদের শিক্ষা ব্যবস্থাও যে পুরোপুরি ধর্মবিদ্বেষী ধারার হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। অপরদিকে, গবেষণাধর্মী আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা ইসলামের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের জন্য দূষণীয় নয়; বরং বিজ্ঞানের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মুসলিমরা পশ্চিমা সভ্যতার যে প্রাণশক্তিকে থেকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, সেটা বিপজ্জনক।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে নীতিভ্রষ্ট পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই সভ্যতা চুপিসারে কেবল আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেই প্রবেশ করেনি, ঢুকে পড়েছে আমাদের সমাজ কাঠামোতেও। মুসলিমরা আজ পশ্চিমাদের আচার-আচরণ ও জীবন-যাপন হুবহু নকল করছে। ফলে পাশ্চাত্যের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আস্তে আস্তে নিজেকে খাপ খাওয়াতে বাধ্য হচ্ছে। আসলে কোন ধ্যান-ধারণার বাহ্যিক অনুসরণ ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, শেষমেষ ওই ধারণা অনুযায়ী আমরা গোটা বিশ্বকে দেখতে বাধ্য হই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসলীলা

রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর বিস্ময়কর উন্নতি ও অগ্রগতিতে একশ্রেণীর লোকের মন-মগজ অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মনে এই ধারণার সঞ্চার হয়েছে যে, ঐ জাতিগুলোর উন্নতি ও তারাক্কি হয়তো বা অক্ষয়, অবিনশ্বর। দুনিয়ায় তাদের প্রভুত্ব ও আধিপত্য চিরতরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পৃথিবীর রাজত্ব ও উপায়ে উপকরণের কর্তৃত্বের ব্যাপারে একেবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। তাদের শক্তি ও ক্ষমতা এমনই মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তা উৎখাত করা কারোও পক্ষেই সম্ভব নয়।

বস্তুত এটা কোন নতুন ধারণা নয়; বরং প্রত্যেক যুগের প্রভাবশালী জাতিগুলো সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা হয়েছে। মিশরের ফেরাউন বংশ, আরবের আদ ও সামুদ, ইরাকের কালদানি, ইরানের কিসরা, গ্রীসের দিগবিজয়ী বীর, রোমের বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট, জগজ্জয়ী

মুসলিম মুজাহিদ, তাতারীদের দুনিয়াখ্যাত সেনাবাহিনী প্রমুখ সবাই এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে একই রূপ প্রভাব ও শক্তির তামাশা দেখিয়ে গেছেন। পালাক্রমে এরা প্রত্যেকেই আপন আপন ভোগবাজির নৈপুণ্য দেখিয়ে একইভাবে দুনিয়ার মানুষকে বিস্মিত করে দিয়েছেন। যখন যে জাতিই মাথা তুলেছে, এভাবেই সে দুনিয়ার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। এমন করেই সে বিশ্বময় নিজের খ্যাতি, যশ ও বীর্যবত্তার ডঙ্কা বাজিয়েছে আর এভাবেই দুনিয়ার মানুষ ধারণা করে নিয়েছে যে, তাদের শক্তি ও ক্ষমতা অক্ষয় ও অবিনশ্বর। কিন্তু তাদের আয়ুষ্কাল যখন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং অক্ষয় ও অবিনশ্বর ক্ষমতার অধিকারী সম্রাট তাদের কর্তৃত্বের অবসান ঘোষণা করেছেন, তখন তাদের এমনই পতন ঘটেছে যে, অধিকাংশ জাতিই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় পাশ্চাত্য জাতিগুলোর উপর দুটি প্রচন্ড শয়তান চেপে বসেছে। তারা তাদের ধ্বংস ও বিনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার একটি হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা বংশ নিধনের শয়তান আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জাতীয়তাবাদের শয়তান। প্রথম শয়তানটি চেপে বসেছে তাদের ব্যক্তিদের উপর, আর দ্বিতীয়টি বসেছে তাদের জাতি ও রাজ্যসমূহের উপর। প্রথমটি তাদের পুরুষ ও নারীদের বিবেক-বুদ্ধিকে বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের নিজস্ব হাত দ্বারাই তাদের বংশধরদের নিধন করাচ্ছে। তাদের গর্ভনিরোধের কলা-কৌশল শিক্ষা দান করছে। গর্ভপাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। বন্ধ্যাত্বকরণের মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছে। এর ফলে তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় শক্তি তারা নিজেরাই বিনষ্ট করে ফেলছে। এটি তাদের এমনই হৃদয়হীন করে দিয়েছে যে, তারা নিজেদের সন্তানকে নিজেরাই হত্যা করছে। মোটকথা, এই শয়তান ক্রমশ তাদের আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করাচ্ছে।

দ্বিতীয় শয়তানটা তাদের বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাধ্যক্ষদের থেকে নির্ভুল চিন্তা ও সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। সে তাদের মধ্যে আত্মসর্বস্বতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিহিংসা, ঘৃণা বিদ্বেষ ও লোভ-লালসার কুৎসিত মনোবৃত্তি পয়দা করেছে। তাদের পরস্পর বিদ্যমান ও বৈরী ভাবাপন্ন বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে দিচ্ছে।

يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

“তিনি তোমাদের বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে দিবেন এবং এক দলের দ্বারা আরেক দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন”। *[সূরা আনআম, ৬:৬৫]*

তাদের পরস্পরের শক্তি ও ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এ-ও হচ্ছে এক ধরনের খোদায়ি আজাব।

মোটকথা, সে তাদের এক প্রচন্ড আত্মহত্যার জন্য তৈরি করেছে। এটি পর্যায়ক্রমে নয়; বরং আচানক অনুষ্ঠিত হবে। সে তামাম দুনিয়ায় গোলাবারুদ জমা করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিপদকেন্দ্র বানিয়ে রেখেছে। এখন সে কেবল একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষমান। সেই মুহূর্তটি আসামাত্র সে কোন একটি বারুদাগারকে অগ্নিশলাকা দেখিয়ে দেবে। তারপর তা দেখতে না দেখতেই এমন ধ্বংসলীলা বিস্ফোরিত হবে, যার ফলে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসলীলাও ম্লান হয়ে যাবে।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে, তাতে কোন অত্যুক্তির অবকাশ নেই; বরং ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানে আসন্ন মহাযুদ্ধের বিপুল প্রস্তুতি দেখে খোদ তাদেরই দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ শিউরে উঠেছেন এবং এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করে তারা অত্যন্ত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি মার্কিন মিলিটারি স্টাফের প্রাক্তন সদস্য সার্জেল নিউম্যান (Sergel Neuman) আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আসন্ন যুদ্ধ শুধু সৈন্যদের লড়াই হবে না; বরং তাকে ব্যাপক গণহত্যা বলাই হবে সমীচীন। এই হত্যাযজ্ঞে নারী ও শিশুদের পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হবে না। বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের দায়িত্বটা সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রাসায়নিক দ্রব্য ও নিষ্প্রাণ যন্ত্রের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। এই মরণাস্ত্রগুলো সামরিক ও অসামরিক লোকের মধ্যে পার্থক্য করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর এই যুদ্ধমান শক্তিগুলোর লড়াই ময়দান বা দুর্গের মধ্যে নয়; বরং শহর, বন্দর ও লোকালয়ের মধ্যে হবে। কারণ আধুনিক যুদ্ধনীতি অনুযায়ী শত্রুপক্ষের আসল শক্তি সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়; বরং তার জনপদ, বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্পকারখানার মধ্যে নিহিত। পরবর্তীকালে আনবিক বোমা ও উদযান বোমা নামে এর চাইতেও ভয়ংকর মরণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে তার ধ্বংসলীলার একটি ক্ষুদ্র নমুনাও পেশ করা হয়েছে। আরও অনেক নতুন নতুন অস্ত্র ও মরণবোমা আবিষ্কার করা হয়েছে।

সুতরাং, সহজে অনুমান করা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা কিভাবে নিজের ধ্বংসের উপকরণ নিজের হাতেই সংগ্রহ করেছে। এখন তার আয়ুষ্কাল রয়েছে শুধু তার যুদ্ধ ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত। একটি খোদাহীন সভ্যতা কিভাবে একটি গোটা জাতিকে হিংস্র পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতর জীবে পরিণত করতে পারে তার নিদর্শন অচিরেই দেখতে পারবে।

মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম শূন্যতা

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম শূন্যতা হল এক মহানুভব মহান নেতা ও উৎসাহী ব্যক্তির যিনি সাহস, বিশ্বাস, সততা ও নিশ্চয়তার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হবেন। এই আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন কাঠামো, বিভিন্ন চিন্তা ও রাস্তার মধ্যে একটি নতুন সড়ক সৃষ্টি করবেন, সেই সড়ক অনুসরণ, অতিশয়োক্তি ও সীমালঙ্ঘনজনিত দোষ হতে মুক্ত হবে যিনি বাহ্যিক আকৃতি প্রিয় প্রদর্শনী ও হালকা দৃষ্টিভঙ্গি হতে ঊর্ধ্বে হবেন। সত্য, যোগ্য উপকরণ, শক্তি ও সার নিখাদ বস্তুর দিকে মনোযোগ দিবেন এবং বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতি আমল দেবেন না।

শেষকথা

পশ্চিমারা খুব ভালো করেই জানে যদি বিশ্বব্যাপী তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আধিপত্য ধরে রাখতে হয় এবং গোটা বিশ্বকে ভোগবাদী ও বস্তুবাদীকরণ করতে হয়, তাহলে তাদের জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শকে অন্যদের জন্য অনুসরণীয় বানাতে হবে। এই ফাঁদ পেতে মানুষের বিবেককে স্বীয় প্রভাববলয়ে নিয়ে আসতে হবে। মানুষের চিন্তা-ধারা ও ধ্যান-ধারণার উপরই প্রথম হামলা চালাতে হবে। তাই তারা তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গোটা বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করেছে। বর্তমানে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ভয়াবহ আগ্রাসন চলছে। এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে ইসলামী বিশ্ব শুধু বস্তুগত মানবিক দিক দিয়েই চরম ক্ষতিগ্রস্ত নয়; বরং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আকিদা-বিশ্বাস থেকেও দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আকিদা-বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বানিয়ে দিচ্ছে। অপরদিকে সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈচিত্র এবং স্বাতন্ত্র্য নির্মূল করে একটি আন্তর্জাতিক সভ্যতা তথা মার্কিন সভ্যতাকে গোটা মানবসমাজের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে শুধু মুসলিম উম্মাহই নয়; বরং প্রতিটি দেশ ও জাতিগোষ্ঠী তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাচ্যের জাতিগোষ্ঠীকে নগ্নতা অশ্লীলতার পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারাও পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামি করতে বাধ্য হয়।

নতুন ফিতনা, নতুন শক্তি, নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা এবং নতুন আহ্বান মোকাবিলা কমজোর ঈমান ও কেন কেবল রসম রেওয়াজ ও আচার অভ্যাস দিয়ে করা যাবে না। কোন জরাজীর্ণ ও দশাপ্রাপ্ত প্রাসাদ নতুন সাইক্লোন ও নতুন কোন প্লাবনে ধাক্কা সইতে পারে না। তাই মুসলিম বিশ্ব যদি মনুষ্য জগতে নবতর রুহ ও নতুন জীবন সৃষ্টি করতে চায় এবং দুনিয়ার বর্তমানের বস্তুবাদীতা এবং সন্দেহ-সংশয় ও অস্থিরতার ওপর জয়লাভ করতে চায় তাহলে তাকে তার ভেতর নতুন ঈমানি শক্তি, জীবন্ত ইয়াকিন ও নতুন উৎসাহ- উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। চেতনাবোধের প্রশিক্ষণ কোন জাতির জন্য সর্বাধিক বিপজ্জনক বিষয় হলো, সে জাতি সঠিক জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনাবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের চেতনাবোধ তৈরি হবে এবং দৃষ্টি যতদিন না পরিণত ও পাকাপোক্ত হবে ততদিন এই বিপদাশংকা থেকেই যায় যে, তারা অন্য কোন আহ্বান ও আন্দোলনের পরিণত হবে এবং দেখতে না দেখতেই শত শত বছরের শ্রম ও সাধনাকে ব্যর্থ ও নিস্ফল করে দিবে।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের জন্য জরুরী হলো, শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে নতুন করে ঢেলে সাজানো যা হবে তার রুহ ও তার পয়গামের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। মুসলিম বিশ্ব প্রাচীন পৃথিবীর ওপর তার জ্ঞানগত নেতৃত্ব কায়েম করেছিল এবং দুনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল। সে দুনিয়ার সাহিত্য ও দর্শনের হৃৎপিণ্ডে তার বাসা বানিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী সভ্য দুনিয়া তার বুদ্ধি নিয়ে চিন্তা করেছে, তার কলম দিয়ে লিখেছে এবং তারই ভাষায় লেখালেখি করেছে, গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ভূ-পৃষ্ঠের খিলাফত প্রদান করা হয়েছিল সৃষ্টি সম্পর্কীয় জ্ঞানের কারণেই। সুতরাং দ্বীনি ও জাগতিক দু-ধরনের জ্ঞান জীবন নামক গাড়ির দুটি চাকার ন্যায়। যেমন যেকোনো একটি চাকা বিকল হয়ে গেলে গাড়িটি আর সামনে অগ্রসর হতে পারে না। তদ্রুপ মানুষ যদি দ্বীনি জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় তাহলে মানুষ ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে, আর যদি জাগতিক জ্ঞান থেকে দূরে সরে যায় তাহলে পৃথিবীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

নবুওয়াতের যুগ থেকে নিয়ে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের সার্বজনীন ইসলামি একক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেমনিভাবে হাফেজ, আলেম, মুফতি, ইমাম ও খতিব বের হয়েছেন তেমনিভাবে ইতিহাসবিদ, ভূগোলবিদ, রসায়নবিদ, গণিতবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, শাসক ও সেনাবাহিনীও বের হয়েছেন। অতএব মুসলিম উম্মাহকে আবার তার হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে হলে তাকে অবশ্যই গণমুখী, উৎপাদনমুখী সার্বজনীন ইসলামি একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। জ্ঞান-গবেষণা ও লেখার ময়দানে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন মুসলিম সমাজে এমন চিন্তাবিদ ও তথ্যানুসন্ধানীর আবির্ভাব হতে হবে, যারা চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-গবেষণা ও লেখালেখির ময়দানে আত্মনির্ভরশীল হবেন এবং এর সাহায্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার গোটা ভিত্তিমূলকেই ধসিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা সাঈয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. বলেন, ইসলামি বিশ্বকে চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান-গবেষণা ও লেখার ময়দানে আত্মনির্ভরশীল এবং ওরিয়েন্টালিস্টদের ইলমি গবেষণার বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। তিনি বলেন, ওরিয়েন্টালিস্টদের নেতিবাচক প্রভাব প্রতিক্রিয়ার নির্মূল ও তাদের বিশাল ত্রুটির সংশোধনের জন্য উলামায়ে ইসলাম, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও মুসলিম রিসার্চ স্কলারদের দায়িত্ব হল ইলমি বিষয়ে গবেষণাসমৃদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থাবলি রচনা করা এবং ইসলামি বিশ্বকে সঠিক নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-গবেষণা ও ইসলামের নির্ভেজাল সঠিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করানো। ঐসব সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে, যেগুলো ওরিয়েন্টালিস্টদের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, বরং ইলম পদ্ধতি, গবেষণার নীতিমালা, গভীর

বিশ্লেষণ, সুগভীর দৃষ্টি, ব্যাপক অধ্যায়ন, নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স, তথ্যসূত্র ও শক্তিশালী দলিল প্রমাণের ক্ষেত্রে তাদের থেকেও অগ্রগামী হওয়া এবং ঐসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ইলমি দুর্বলতাগুলো থেকেও নিরাপদ থাকা, যেসব ক্ষেত্রে সাধারণত ওরিয়েন্টালিস্টরা পদস্থলনের শিকার হয়েছে। এ কাজটির গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লামা নদবি লিখেন— যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজটি আনজাম না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি বিশ্বের আধুনিক শিক্ষিত মেধাবী, সাহসী যুবসমাজ যারা ইউরোপ, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় লেখাপড়া করছে কিংবা নিজ দেশে ইউরোপিয়ান ভাষায় ইসলাম নিয়ে অধ্যায়নে অভ্যস্ত, তাদের ওরিয়েন্টালিস্টদের বিষাক্ত চিন্তাধারা ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক গোলামি থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। শক্তিশালী সাহিত্য রচনা করা, এ যুগ বাসার সাহিত্যের যুগ। ভাষা সাহিত্যের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতা মুসলিমবিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। তাই মুসলিম উম্মাহকে ভাষা সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে।

মোটকথা, এই শক্তির হাত থেকেই ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। এমন অনবদ্য সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে যেন অন্য কেউ আর ফিরেও না তাকায়। তথ্যপ্রযুক্তি ও মিডিয়ার শক্তি অর্জন করা শত্রু যে পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে তার জবাব সে পদ্ধতিতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। শত্রু আজ মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তির ছিদ্র পথ দিয়ে দিন দুপুরে আমাদের ঈমান-আকিদার ওপর হামলা চালাচ্ছে। সেই হিসেবে তার জবাবও সেই তথ্যপ্রযুক্তি ও মিডিয়ার পথ ধরে দিতে হবে। সে লক্ষ্যে আমাদের শক্তিশালী ও কার্যকর ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রচলিত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আমাদের লোকজনদের ব্যাপক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

এমনিভাবে ইসলামের ধারক-বাহকদের আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিতে শক্তি অর্জন করতে হবে এবং সেগুলো ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন বাদ-মতবাদের অসারতা প্রমাণ করা ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী চলমান বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন মোকাবিলায় একদল যোগ্য মেধাবী কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে, যাদের লেখনী, জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধিভিত্তিকভাবে সমৃদ্ধশালী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যারা ইসলামী বিশ্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা, পাশ্চাত্যের জীবনব্যবস্থা, নীতি আদর্শ, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতিসহ সমকালীন সকল ইসলামী বিরোধী বাদ-মতবাদ নিয়ে গবেষণা করবেন এবং তাতে ব্যুৎপত্তি হাসিল করে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন। শিশুদের নিষ্পাপ সাদাসিধে মন ফলকের উপর কালিমা লেপে দেওয়া হয়। এসব কার্টুন ও মুভিতে সাধারণত দড়িবিশিষ্ট মানুষদের

শয়তান ও ভূত দৈত্য বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়। এভাবেই জীবনের সূচনাতে শিশুদের কচিকাঁচা কোমল মনে ইসলাম বিরোধী পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে জীবন বাড়ার সাথে সাথে দ্বীন ও ধর্মের প্রতি তারা ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হতে থাকে।

অন্যকথায়, পূর্ণ এক শতাব্দী হতে চলেছে ইউরোপ আমাদের যুবক ও শিক্ষিত শ্রেণীর মস্তিষ্ক বিকৃত করে আসছে। সংশয়, সন্দেহ, ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, ভন্ডামি ও প্রতারণার বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে তাদের হৃদয়ে, চিন্তা-চেতনায়। এতে ধর্মীয় সকল বিষয়ে তাদের ঈমান নড়বড়ে হয়ে পড়েছে এবং সেখানে স্থান করে নিয়েছে বস্তুতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা। নতুন শতাব্দীর উষালগ্নে আজ আমরা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন। আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর ঈমান ও বিশ্বাস আজ নড়বড়ে, ঘুনে ধরা। এমন এক প্রজন্ম আমাদের শাসন ক্ষমতা আসছে যাদের না ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের উপর ঈমান আছে, না তাদের মধ্যে ইসলামপ্রীতি, ইসলামি চেতনাবোধ এবং সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসনকে প্রাধান্য দেওয়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, না তার মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে জাতিগতভাবে সেও গণনায় মুসলমান এই সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক আছে। আর যদি কিছু সম্পর্ক থাকেও তা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য। ব্যস, এ ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। এখনকার অবস্থা তো এর চেয়েও নাজুক। ধর্মবিবর্জিত মানসিকতা, অধর্মীয় চিন্তাধারা, বিজাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতিপ্রীতি আমাদের সাধারণ জনগণ ও গ্রামীণ জীবন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আজ মুসলমানদের মাথার ওপর ব্যাপক ধর্মহীনতার নাঙ্গা কৃপাণ ঝুলছে। সুতরাং এ অবস্থা থেকে আমাদের বাঁচতে হলে নদবি রহ. এর উল্লিখিত কথাগুলোর বাস্তবায়নে আমাদের শতভাগ সচেষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত